



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 489 - 504

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের এক বিস্মৃত অধ্যায়

মনোমিতা প্রধান

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: manomitaproddhan.m.1995@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Abstract

Discussion

সাহিত্যিক বরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সু-বিপুল এই বাংলা সাহিত্যের আড়িনায় এক বিস্মৃত নাম। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে প্রায় শতাব্দিক গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ সাহিত্য, শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনা করেও তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে অনাদৃত-অনালোচিত হয়েই রইলেন। নিভৃতচারী এই লেখকের কাছে লেখার মূল মানদণ্ডই ছিল ‘সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা’ নয় বরং সাহিত্যে তাঁর ‘আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা’ -

“আমার বোধের কথা, আমার বিশ্বাসের কথা বলে যাওয়ার কিছু কিছু দায়িত্ব আমার আছে, সে কথা বলার জন্যই আমাকে লিখতে হয়।”^১

লেখকের এই ব্যক্তিবিশ্বাস তথা গভীর আত্মপ্রত্যয় তাঁর সাহিত্যচর্চাকে সাহিত্য সাধনায় পর্যবসিত করেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, সমগ্র বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়। বিশ্বযুদ্ধের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক দলাদলি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দাঙ্গা-মহামারী উদ্ভূত বৃহৎ মানুষ, সবকিছু মিলিয়ে সাহিত্যের কলম তখন শাণিত হচ্ছিল ক্ষুরধার লেখনীতে। সমাজ ও সাহিত্যের এই ক্রান্তি লগ্নে সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এর আবির্ভাব। লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত আলাপচারীতায় রয়েছে সমাজের সেই ক্ষয়িষ্ণু রূপ -

“ঘুম থেকে উঠলেই যে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠত তা এক বিভীষিকা : দেখতাম, দরজার বাইরে নিরন্ন পুরুষ মহিলা শিশু ধরনা দিয়ে পড়ে থাকত সামান্য একটু ফেনের আশায়। মানুষের সর্বগ্রাসী অমন একটা ক্ষুধার চিত্র সেই কৈশোরেই দাগ বসিয়ে দিয়েছিল আমার চিন্তার জগতে।”^২

সমাজ-সভ্যতার এই যুদ্ধতরঙ্গকে অঙ্গীকার করে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য জীবন-যন্ত্রণার দলিল ভাষ্য হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যের উপজীব্য শান্ত-ম্লিষ্ট যে গ্রামীণ জীবন, চল্লিশের দশক থেকে তার রং ফিকে হতে থাকলো। বিশ্বযুদ্ধের এই নতুন যুগের বাঙালি সাহিত্যিকদের একমাত্র অস্থিষ্ঠ হয়ে উঠল কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের সামগ্রিক বাস্তবতা। কিন্তু এরই মাঝে পঞ্চাশের দশকের কিছু লেখক সাহিত্যের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদে নির্বাঞ্ছিত গ্রামকে বেঁছে নিয়েছিলেন লেখার উপকরণ হিসেবে। সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তাদেরই একজন, নিভূতে বিচরণকারী এই সাহিত্যিক ছিলেন সুন্দরবনের শান্ত কথাকার। গ্রাম বাংলার নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক আখ্যানে নিজ সাহিত্যকে লালিত করেছেন লেখক।

তবে শুধুমাত্র সুন্দরবনই নয় বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যসম্ভার বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। তাঁর উপন্যাস রাজির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সুন্দরবনের গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ তেমনি অন্যদিকে আমরা দেখবো কলকাতার নাগরিক ব্যস্ততম জীবনের তথাকথিত আধুনিক মানুষের বিপন্ন বিস্ময়। রয়েছে বেশকিছু রহস্য রোমাঞ্চ পূর্ণ উপন্যাস, রয়েছে গোয়েন্দা তথা ডিটেকটিভ উপন্যাস, রয়েছে মনোমুগ্ধকর ভ্রমণ সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, সারল্যে পরিপূর্ণ কিশোর উপন্যাস এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ছোটগল্পের এক বিপুল সম্ভার। সাহিত্যিক অমর মিত্রের কথায়, -

“আমি তাঁর অনুরাগী পাঠক। ...বরেনদা ছিলেন খুব সাদা সিঁদে মানুষ। অকৃতদার। ধুতি পাঞ্জাবি। আমি তাকে প্রথম চিনি তাঁর ‘নিশীথ ফেরী’ উপন্যাসে। সেই ৪০-৪৫ বছর আগের এই শহর। অস্ত্র নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছে এক যুবক। আমি পড়ে আধুনিক সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলাম। ...বরেনদা অনেকদিন সুন্দরবনের একটি স্কুলে মাস্টারি করেছিলেন। তারপর আসেন যুগান্তরে। সেই কাগজ বন্ধ হলে তিনি লেখাতেই ছিলেন শুধু। কিছুদিন কলেজস্ট্রিট পত্রিকা সম্পাদনা করেন। গল্প বিচিত্রা নামে একটি গল্পের কাগজ সম্পাদনা করেন। তাঁর ছিল পাহাড়ের নেশা। বছর বছর পাহাড়ে, তুষার সাম্রাজ্যে যেতেন। এই স্নেহময় অগ্রজের সাথে অনেক আড্ডা দিয়েছি। বরেনদার সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা তাকে দিয়ে অনেক আশ্চর্য গল্প ...আশ্চর্য উপন্যাস লিখিয়ে নিয়েছিল। ...বরেনদার লেখায় নদীর সাথে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। ...আসলে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে এতো কথার কারণ, এই গুণবান লেখককে ভুলে যাচ্ছি আমরা। যাদের নিয়ে আমরা অতি হৈহৈ এ মাতি, তাদের সঙ্গে তাঁর কত পার্থক্য। ...বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এর গল্পে ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ আর এক নিজস্ব ভুবন। নিজস্ব ভুবনের সৃষ্টি কম লেখকই করতে পারেন। বরেনদা তা করেছিলেন। তাঁর গল্প বলা কাহিনী কখন নয়। সেই গল্প বিচিত্র কল্পনা, ফ্যান্টাসি এমন এক দর্শন, এমন এক উপলব্ধির জন্ম দিত যা এখনও বিরল মনে হয়। বাস্তবতা আর অলীকতা দুয়ের ভিতর পরিভ্রমণ করত বরেন দার গল্প।”^৩

১৯৩০ সালের ৩ জানুয়ারি, ঢাকার বিক্রমপুরের কয়কীর্তন গ্রামে জন্ম বরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পিতা মনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুরদা গিরীশ গাঙ্গুলী ছিলেন ছন্নছাড়া উদাসীন প্রকৃতির একজন মানুষ। সাত ভাই-বোনের সংসারে ছেলেবেলায় চরম দারিদ্র্যতায় দিন যাপনের কঠিন সত্য রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, -

“ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলাম, আমার ঠাকুরদা যখন মারা গেলেন তখন তাকে দাহ করার জন্য একটা আমগাছ কাটা হয়েছিল। সংসারে তখন চরম দুর্গতির দিন। ঠাকুরদা ছিলেন অলস নির্বিরোধী মানুষ, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জায়গা জমি বিক্রি করে চতুর্দিক থেকে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিলেন। থাকার মধ্যে তখনও ছিল পুঁজি আর পশ্চিমের ভিটেতে দু-খানা চারচালা, আমিষ আর নিরামিষের দু-খানা রান্নাঘর, সামান্য একটু উঠোন, আর ছিল গুটি কয়েক আমগাছ। সেই আমগাছেরই একটা কেটে নিয়ে ঠাকুরদাকে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু দাহ করার সময় পিণ্ডাদি কাজের জন্য যে চালটুকু প্রয়োজন তা নাকি ভিক্ষে করতে হয়েছিল আমাদের।”^৪

লেখকের জন্মের পর তাঁর পিতা মনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগ্যবশেষে ঢাকা থেকে পাড়ি দেন ঝাড়খণ্ডের শাল-মহুয়া অরণ্যবেষ্টিত এক জনপদ কালিমাটিতে, যার পরিবর্তিত নাম হয় টাটনগর। এই টাটার কারখানাকে ঘিরে চারপাশের যে শহর গড়ে উঠেছিল সেই লৌহনগরীর নাম হয় জামশেদপুর। এই শিল্পনগরী বলাবাহুল্য লৌহনগরী জামশেদপুরেই লেখকের শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, এখানেই তাঁর প্রথম স্কুল জীবনের হাতেখড়ি। এই লৌহনগরীর ইট-কাঠ-সিমেন্টের মাঝেই অন্যতর এক জীবনের বীজ রোপিত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাড়া বাড়ি ছিল জামশেদপুর এর চম্বল রোডে। তাঁর বাড়ির পাশেই ছিল এক মেস বাড়ি আর সেখানে থাকতেন লেখকের সাহিত্য সাধনার প্রথম পথ প্রদর্শক ‘ঋষিতুল্য পুরুষ’ ফল্লু কর মহাশয় -

“জামশেদপুরের লোহা লব্ধের এর মধ্যেও যে রস নিয়ে খেলা করার কথা কেউ ভাবতে পারেন তা ছিল আমার ধারণার অতীত। ঐ বিশেষ ব্যক্তিটি আমার মাথায় প্রথম ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন কবিতা ভাবনা।

কবিতা লিখতে বসে মিলের পর মিল খুঁজে খুঁজে হয়রান হলে কি করুন অবস্থা হত এখন আর তা ভালো করে মনে পড়ে না তবে জুতসই একটা মিল খুঁজে পেলে যে ডবল প্রমোশন পাওয়ার চেয়েও বেশি আনন্দ তা সেই বয়সেই টের পেয়েছিলাম তখন ওইভাবেই অস্বস্তি আনন্দ আর মজার ভিতর দিয়েই আমার সাহিত্যের প্রথম পার্ট শুরু হয়েছিল।”^৫

তবে ফল্ট কর ছাড়াও কাব্যচর্চার উৎসাহদাতা হিসাবে আরও একজনকে প্রিয় সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি ‘কবি স্বদেশ সেন’ –

“স্বদেশকেই বলা চলে আমার একমাত্র শ্রোতা আমি স্বদেশের।”^৬

অধ্যাপক অভ রায় এর ভাষায়, –

“কাব্যচর্চার উৎসাহদাতা একজন প্রিয় সঙ্গীও পেয়েছিলেন তখন জামশেদপুরে। তিনি পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি স্বদেশ সেন। পরে একসময় তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল জামশেদপুরে। গল্প করতে করতে স্বদেশ তখন রহস্য করে দেখিয়েছিলেন আমাদের সেই কাব্যচর্চার পীঠস্থানটি। রাস্তার পাশেই একটি নির্জন গাছতলা, চারদিকে জমা শুকনো পাতার ডাই, পাখি ডাকছে বকুলগাছের মাথায়, শুকনো পাতা ওড়ার এলোমেলো শব্দ। স্বদেশ দেখালেন, এই এখানেই শুরু হয়েছিল একদিন সেই কাব্যচর্চার প্রথম পর্ব।”^৭

তবে সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যঙ্গনে আবির্ভাব কবিতা নয় বরং ছড়ার মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, এই সময়কালে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সদ্য নবাগত লেখক হিসাবে যখন কলম ধরলেন, তখন সমগ্র বাংলা সাহিত্য জুড়ে কেবল প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, দাঙ্গা-দেশভাগ এর ফলস্বরূপ ছিন্নমূল-হতাশাগ্রস্ত মানুষের বেকারত্ব-দুঃখ-যন্ত্রণার চরমতম রূপ। নতুন কালের বাংলা সাহিত্য তখন টালমাটাল মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা-গ্লানির ছবিতে। কবিতার ছত্রে ছত্রে দেখা যাচ্ছে জ্লোগান। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এই সময়ে নতুন করে ভাবছেন সাহিত্যের বিষয়-আশয় নিয়ে, ছড়া নিয়েই মশগুল রয়েছেন তিনি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যে কৌতুক তা ছড়ায় যেমনটা ফোটাতে পারেন আর কিছূতে তেমন নয়। লেখক তখন ছড়ার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। তাঁর মনে হয়েছিল অবিচার অনাচার ব্যঙ্গ কৌতুক ছড়ায় যতটা ধরা যায় সাহিত্যের আর কোনো শাখায় তা ধরা যায় না। ছাপার অক্ষরে লেখকের প্রথম বইও ছিল একটি ছড়ার বই ‘বর্গী এলো দেশে’। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, –

“লেখাজোখার অনেক আগেই ছড়ার জন্ম। মুখে মুখেই তৈরি হ’ত ছড়া মুখে মুখেই চলত। ধান ভানতে ভানতে ছড়া, ঘুম পাড়ানোর ছড়া, ব্রত উৎসর্গের ছড়া, নিন্দে প্রসংশার ছড়া। যে যুগে বই পুঁথি ছিল না, সে যুগে বড় বড় ঘটনাগুলো লোকে মনে ক’রে রাখার জন্যে ছড়া বাঁধত। কোন ছড়াটা কে বেঁধেছে কেউ জানে না। কেউ বেঁধেছিল নিশ্চয়। আকাশ থেকে পড়ে নি। কিন্তু যেই বেঁধে থাক, ছড়া বাঁধার পর আর তার থাকে নি। সে ছড়া হয়েছে সকলের। কেন না সকলের কথাটাই ছড়ায় মুখ ফুটে বলা হয়েছে। ছড়া কি শুধু পুরনোই। নতুন ছড়া হবে না? হবে। যে ছড়া আমরা মা – ঠাকুমার মুখ থেকে শুনে থাকি সেই ছড়াই কি ষোলো আনা পুরনো? না। ছড়ার মধ্যে যুগে যুগেই অদল বদল ঘটেছে। আগের যুগের ছড়ায় পরের যুগের মানুষ তার জীবনের কথাটাও সুবিধে মতো গুঁজে দিতে ছাড়ে নি। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বর্গী এলো দেশে’ বইতে ছড়ার সেই চিরদিনের ধারাকেই সচেতনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সব জায়গায় যে তিনি সফল হয়েছেন, তা নয় কিন্তু যে রাস্তায় শক্ত পায়ে তিনি এগিয়েছেন আমাদের অনেকেরই তা অনুকরণযোগ্য।”^৮

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বর্গী এলো দেশে’ র পর আমরা প্রায় এক শতাব্দী এগিয়ে এসেছি কিন্তু তাঁর ছড়াগুলি আজও ততটাই প্রাঞ্জল এবং যুগোপযোগী। সেদিনের কৃতিবাস পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্কুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামে ‘বর্গী

এলো দেশে’ ছড়ার বইটির সমালোচনা করে বলেছিলেন, ‘জীবনের যাবতীয় ভন্ডামি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ছড়াগুলি যেন এক স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষে মুখর’ -

“শুনুন মশাই শুনুন...

বাতাস বুঝে চলুন

বাঁচতে হলে আমার মত

মনের কথা বলুন

নিজের কোলে ঝোল টেনে আজ

একশোটা লোক দলুন।”

লেখকের উপদেশবাচক ইঙ্গিতটি আজও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। আবার ‘বর্গী এলো দেশে’ ছড়ার বই এর নাম ছড়টিতে লেখক ছড়ার হালকা চালে ধিক্কার জানিয়েছেন তথাকথিত দেশ নায়কদের, -

“ঘুমপাড়ানী মাসি পিসী

ঘুমের বাড়ি যাও

খোকার চোখের ঘুম তাড়িয়ে

দেশ ছেড়ে পালাও...

খোকারা যখন ঘুমিয়েছিলো ঘুমিয়েছিলো পাড়া

চুপি চুপি বর্গী এলো কেউ পেলনা সাড়া

সোনার দেশে বর্গী এলো, এলো মহামারী

আকালে দেশ ছাইলো এসে বন্যা সে কি ভারী।

খোকারা যখন ঘুমিয়েছিলো দেশটা ছিল ঘুমে

সর্বনাশী ডাইনি এসে রক্ত নিল চুমে

কেটে কেটে কাটা গায়ে ছিটিয়ে দিল নুন

গরম ভাতে পড়ল মাছি পড়ল দুধে চুন।

খোকারা যখন ঘুমিয়েছিলো বর্গী এলো দেশে

ধানেপানে পঙ্গপালে ভাগ বসাল এসে,

সোনার এদেশ পলে পলে ছন্নছাড়া হল

দুঃখী মায়ের চোখ জোড়া তাই, ব্যথায় টলোমলো।”

তৎকালীন কলকাতার চিত্র রয়েছে ‘হট্টমেলার দেশে’ ছড়াটিতে, -

“আটার সাথে মিশিয়ে দিলাম

গম ভাঙানী খুদ

জলের সাথে খাবুর খুবুর

রাম ছাগলের দুধ

চালের সাথে কাঁকর মেশাই

সপ্তাহে সোম বুধ

তোর কাছে থাক আসল টাকা

মিটিয়ে দিয়ে যা’ সুদ।”

লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়, -

“ছড়ার ভিতর দিয়েই আমি যেন আমার মনের ভাবনাকে বেশি করে প্রকাশ করতে পারতাম। মজার মজার সব শব্দ ভিড় করে দাঁড়াতে মাথায়, সেইসব শব্দ দিয়ে কবিতার গাভীর রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু ছড়ায় হয়ে উঠত তা অমোঘ। ... ছড়ায় অবিচার অনাচার ব্যঙ্গ কৌতুক যত সহজে ধরা যায় আর কিছুতে বোধহয় এতটা নয়।”^৯

তবে লেখকের জীবনে প্রথম পুরস্কার এনে দিয়েছিল একটি ছবি। ১৯৪৭ সাল, জামশেদপুরে তখন ‘চলন্তিকার সুবর্ণ যুগ’ চলছে। দু’দিন-তিন দিন ব্যাপী চলন্তিকার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হত, সাথে চলত ছবির এক্সিবিশন। জামশেদপুরের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এই এক্সিবিশনে শামিল করা হত, সেই সময় কালে লেখক জামশেদপুর এর একটি স্কুলে মেট্রিকুলেশন পড়তেন। জলরঙে ব্রাশ ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিজের খুশিমতো লেখক লিখে ফেলতেন একটি ঐতিহাসিক ছবি। পরবর্তীতে এই ছবিটিই প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিল। এর সাথে লেখকের উপরিপাওনা ছিল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত একটি মানপত্র। যে মানপত্রটি লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘদিন সযত্নে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। লেখকের ভাষায়, -

“ছবিটা যা এঁকেছিলাম তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে। রুক্ষ চৌচির একটা মাঠের পাশে একটা বাড়ি। মাটির দেয়াল, খরের চাল, জীর্ণ হয়ে গেছে। আর সেই বাড়িটার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পত্র একটা কাটা গাছ। বড় অসুন্দর বড় রিক্ত, কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। নিচে ক্যাপশন দিয়েছিলাম আমার মা।”^{১০}

সদ্য কৈশোরপ্রাপ্ত এক যুবকের কাঁচা হাতের প্রথম ছবিটি যে তার বিষয়ের জন্যই পুরস্কৃত হয়েছিল লেখক নিজেও তা স্বীকার করেছেন। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এক উত্তাল ভারতবর্ষ, সমস্ত দেশ তখন উগ্র জাতীয়তাবাদে টলমল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বাঙালি সমাজে নিয়ে এসেছিল বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা। সেই চির প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার হাত ধরেই এল দুর্ভিক্ষ-মহামারী-দেশভাগ-উদ্বাস্তসমস্যা। একদিকে সামাজিক শোষণ অন্যদিকে অপ্রতুল খাদ্য উৎপাদনকে হাতিয়ার করে একদল লোভী কালোবাজারির দল নিজেদের উচ্চ বৃত্তের মর্যাদায় ভূষিত করলেন। এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসনের যুগকাঠে বলি হল অপরিমেয় নিম্নবৃত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ। তাদের জীবনে নেমে এলো বেকারত্ব ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অভিশাপ। প্রত্যেকটি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে ‘চলো দিল্লি পুকারকে’ আবার কখনো কখনো শোনা যায় মুসলিম লীগের জিগীর ‘লড়কে লেগে পাকিস্তান’।

সভ্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে, অভাবের মধ্য দিয়েই ১৯৪৭ সালে মাইট্রিকুলেশন পাশ করেন লেখক। জামশেদপুরে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যখন কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজের বিজ্ঞান শাখার ভর্তি হলেন, তখন মাউন্টব্যাটেন সাহেবের ভাগ বাটোয়ারা শেষ। শিয়ালদায় হামলে পড়া কাতারে কাতারে রিফিউজির ঢল। দেখলেন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের এক ভয়াবহ রূপ, সমগ্র কলকাতা জুড়ে কাতারে কাতারে ছিন্নমূল মানুষের ঢল, -

“চোখের সামনেই ঘুরতে দেখছিলাম রিফুজিরা জমি দখল করে খড় কুটো দিয়ে কলোনি গড়ে নিচ্ছে। চেহারা পাল্টাতে শুরু করলো কলকাতার। চরিত্র পাল্টাতে শুরু করলো কলকাতার।”^{১১}

স্কটিশ চার্চ কলেজের হোস্টেলে, নতুন পরিবেশে সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল লেখকের জীবনে। এই প্রথম পরিচিত পরিবেশের বাইরে বেরোলেন তিনি। মুখোমুখি পরিচয় হলো স্বপ্নের শহর কলকাতার সাথে, কলকাতার কফি হাউস এবং নবযুগের বিখ্যাত সব কবি-সাহিত্যিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল তাঁর, -

“আমি তখন কলেজে ভর্তি হয়েছি। কফি হাউসে আড্ডা জমাতে শুরু করেছি। নতুন নতুন বন্ধুর আবির্ভাব ঘটছে। তেমন বন্ধুই জুটে যাচ্ছিল যাদের দেহেও সাহিত্যের কচ্ছপ কামড়ে বসেছে। সাহিত্যে তখন কম্যুনিষ্টদেরই রবরবা অবস্থা। কবিরা কবিতায় ঢোকাচ্ছেন গ্লোবাল, গল্পে মানুষের শ্রম আর দুঃখ দারিদ্র্যের চেহারাই প্রকট। প্রেমের কাহিনী যিনি শোনান তিনি রিঅ্যাকশনারী। সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড তখন একটাই, প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল।”^{১২}

জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে ‘পরিচয়’, ‘দেশ’, ‘যুগান্তর’, ‘কথামালা’ সহ আরো বেশ কিছু পত্রিকার একের পর এক লেখা ছাপা হতে থাকলো বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক প্রসূন বসু, মিহির সেন, শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তের শুভেচ্ছা বার্তার মধ্যে দিয়ে লেখকের সাহিত্যিক জীবনের শুভ সূচনা হলো। এই সময়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ‘কলেজ স্ট্রীট’, ‘যুগান্তর’ ‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’ সহ বেশ কিছু পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এই যুবক লেখালেখি নিয়েই মেতে আছেন। ছড়া, কবিতা, কলের কলকাতা, কফিহাউস, কফি হাউস এর সাহিত্যিক আড্ডা – গল্প, লেখক বন্ধুদের সঙ্গে লেখার বিষয়-রীতি নিয়ে মাতামাতি, এই নিয়ে জীবনের বেশ কয়েকটা বছর এভাবেই কেটে গেল। কলেজের পাঠ ততদিনে শেষ হয়ে গেছে।

এবার শুরু বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবিকার সন্ধান। লেখকের পিতৃদেবের ইচ্ছে ছিল তাঁর সুযোগ্য পুত্রকে ইঞ্জিনিয়ার করবেন। বলাবাহুল্য লেখক তাঁর পরম পিতৃদেবের ইচ্ছেতেই কলকাতার হোস্টেলে থেকে বিজ্ঞান পড়ছিলেন। কলেজের পড়া শেষ হতে না হতেই লেখকের পিতৃদেবের আদেশ এসে পৌঁছল কলকাতার হোস্টেলে, জামশেদপুরে গিয়ে টাটা কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরিতে যোগদান করার। লেখকের পিতৃদেব মনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জামশেদপুরে টাটা কোম্পানিতে একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, প্রয়োজন ছিল শুধু নিয়মমাফিক ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে গিয়ে হাজির হওয়া, তাহলেই নিরাপত্তাভরা এক সচ্ছল জীবন লেখকের হাতের মুঠোতে। কিন্তু নিভৃতে বিচরণকারী এই লেখকের মনে তখন অন্য আর এক নতুন জীবনের হাতছানি এসে গেছে। মাথার মধ্যে তখন ঘোরের মতো টলমল করছে কলের কলকাতা এবং ‘সাহিত্য’ নামক ক্ষ্যাপা ভূতের পাগলামি। এই সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল জীবনকে দেখার এক অন্যতর জীবনদর্শন। তাইতো অবশেষে কলকাতার কোলাহল, কফি হাউসের সাহিত্যিক আড্ডা, সর্বোপরি শিল্পনগরী জামশেদপুর এর নিশ্চিত নিরাপত্তাময় জীবনের পিছুটানকে অগ্রাহ্য করে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন লেখক এবং উত্তীর্ণ হলেন সুন্দরবনের শান্ত-স্নিগ্ধ এক মহনীয় পরিবেশে। শহুরে সভ্যতার সম্পর্ক ছিল এক আদিম জীবনের কাছাকাছি। নিভৃতচারী এই লেখক পুনরায় জীবনের ব্যস্ততম জীবনের পথে পা বাড়াননি, মূলত তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছিলেন সুন্দরবনের আরণ্যক পরিবেশ, আড়ম্বরহীন-স্বাচ্ছন্দ্যহীন এক নির্বাসিত জীবন।

শহরের স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নিরাপদ জীবন ফেলে এই নির্বাসন তাঁকে অবিশ্বাস্য এক জীবনের পাঠ শিখিয়ে দিয়েছিল। জীবনধারণের তাগিদে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু তুষার চট্টোপাধ্যায় মারফত সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের শম্ভুগরে একটা স্কুল শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন। এখান থেকেই তাঁর জীবনের আর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল, বলাবাহুল্য এটি তাঁর জীবনের ‘সুবর্ণ অধ্যায়’।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল এই চার বছর লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় শম্ভুগরের একটি স্কুলে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। সত্তর টাকা মাইনে, পয়ত্রিশ টাকা ডিএ। কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র কাগজপত্রেই কেননা ডিএ এর অর্ধেক সাড়ে সতেরো টাকা সরকার কেটে নিতেন। আর বাকি সাড়ে সতেরো টাকা ছয় মাস অন্তর অন্তর লেখক হাতে পেতেন। মূলত ছাত্র বেতনের ওপরেই নির্ভর করতে হত সেকালের স্কুল শিক্ষকদের। সুন্দরবনের সেই প্রত্যন্ত এলাকায় ছাত্রদের মাইনে দেওয়ার সাধ্য ছিল না। মাইনের বদলে তারা কখনো ধান, চাল, সবজি দিয়েই গুরুদক্ষিণা সেরে নিত। ছাত্র প্রদত্ত সেই দক্ষিণা সকল গুরুগণ হাতে বসে বিক্রি-পাট্টা করে সমান ভাগে ভাগ করে নিতেন এবং বেতন সংগ্রহের জন্য হোস্টেলের ছাত্র নিয়ে দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। সুন্দরবনে অতিবাহিত এই চার বছর বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনায় সোনার মুকুট যুগিয়েছিল।

ড. দেবজ্যোতি মন্ডল ‘সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে বলেছেন, -

“পঞ্চাশের দশকের কথাকারদের মধ্যে একমাত্র বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ই সম্ভবত সাহিত্য রচনার জন্য প্রায় সম্পূর্ণ সুন্দরবনকেই আশ্রয় করেছেন। সুন্দরবনের বাদা, জলকর, আলা, ঘেরি, ভেড়ি, নদীলিগু গ্রামজীবন - এই সমস্ত নিয়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ‘বনবিবির উপাখ্যান’ (১৯৭৮), ‘সন্ন্যাসী বাওয়ালি’ (১৯৮১), ‘নদীর সঙ্গে দেখা’ (১৯৮০), ‘বাগদা’ (১৯৮৯)-র মতো বিখ্যাত সব উপন্যাস এবং ‘ফাঁদ’, ‘ক্ষুধা’, ‘বস্ত্রহরণ’-র মতো অসংখ্য ছোটগল্প। এই সমস্ত রচনা নাগরিক জীবনের পরিচয়ে সমৃদ্ধ

নয়। বরং বাদা অঞ্চলের মানুষের সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কার ও বিশ্বাসের কোলাজে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য হয়ে উঠেছে মনোগ্রাহী। বরেনের রক্তে মিশে রয়েছে সুন্দরবন।”^{১৩}

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবনের শিক্ষকতার জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও মানসিক প্রশান্তির এক উন্মুক্ত পরিসর ছিল। প্রকৃতিবেষ্টিত সুন্দরবন, বাদা অঞ্চলের আদিম আরণ্যক পরিবেশ, লোকমানুষের সমাজ-সংস্কৃতি-বিশ্বাসই ছিল প্রাথমিকভাবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পথিকৃৎ, -

“সুন্দরবনের নদী, মাটি বাতাসের মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা ভেড়ির উপর দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। নদীর একটা আশ্চর্য বশ করার ক্ষমতা ছিল। বিকেলে সার্ভিস লঞ্চ এসে দাঁড়াত। সারেঙ দের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। নদীতে জোয়ার ভাটার অদ্ভুত এক রঙটন বাঁধা খেলা। সন্ধ্যায় হ্যাঁরিকেনের আলোয় হাটখোলায় বিড়ির ধোঁয়ার মধ্যে বসে সুন্দরবনের গল্প শোনা, কখনো দেখতাম, ভেড়ি ঘোগ আর ধানকাটা নিয়ে দাঙ্গা। দেখতাম একজন সম্পন্ন মানুষ কেমন করে রক্ষিতা পোষে আর বন্দুক রাখে। দেখতাম ঝড়ে, বৃষ্টিতে, বানে কেমন করে লড়াই করে মানুষ। কেমন করে মানুষই সর্বস্ব হারায় মানুষের কাছে। আবার সব পেয়েও যেন মানুষের কিছুই পাওয়া হয় না। সুন্দরবনে কয়েক বছর ঐভাবে নির্বাসিত জীবন না কাটালে এসব হয়তো কোন কালেই জানা হত না। মানুষ আর প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ একটা ধারণা জন্মে যাচ্ছিল এ সময় থেকে। ভেতর থেকে এসব কথা লেখারও একটা তাগিদ বোধ করছিলাম। ... গদ্য লেখার লোভে পড়ে গেলাম।”^{১৪}

সুন্দরবনে থাকাকালীন বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বজরায় ঘুরে বেরিয়েছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। দেখেছেন স্টেট রিলিফ এর দয়ায় বেঁচে থাকা বৃত্তহীন মানুষগুলিকে, দেখেছেন সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল, বাগদা, জলকর, মধু সংগ্রহক মানুষগুলির কঠিন জীবনযাত্রা। বাঘ-সাপ-কুমিরের সাথে লড়াই করে প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। প্রতি মুহূর্তে অসহায়-ভাগ্যপীড়িত মানুষগুলোর অন্তহীন জীবনসংগ্রাম। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কদর্য রাজনীতি, শোষণ, দলাদলি। সাধারণ মানুষের সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অন্ধবিশ্বাস, এই সমস্ত কিছুই লেখকের অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করেছে। লেখকের ভাষায় ‘সুন্দরবনই আমার সাহিত্য’।

সুন্দরবন সম্পর্কে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে, -

“সুন্দরবনের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় এই সত্যটাকে চরমভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। হাটখোলায় জঙ্গল কেটে বাদা তৈরীর গল্প শুনতাম। বুনো জঙ্গল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, মহামারী বন্যা খরা এ-সবের বিরুদ্ধে মানুষের কি জীবনপণ সংগ্রাম। জঙ্গল নিয়েই যেন সক্রিয় একটা ভূমিকা নিয়ে মানুষকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মানুষই একদিন বিজয়ী হয়ে জয়ের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও সেই সংগ্রামের অবসান ঘটলো না। গুরু হল মানুষে মানুষে বিবাদ। কে কতটা জমি দখল করে নিতে পারি, কে কতটা কৌশলে বা বলে অপরের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে পারি। কত দুর্বল মানুষ সর্বস্ব হারাল এই দ্বন্দ্বে, কত নিঃস্ব বুদ্ধিধর মানুষ সর্বস্ব কুড়িয়ে বিরাট হয়ে উঠল।”^{১৫}

১৯৫৮ সালে লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের স্কুল শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কলকাতার সাহাপুর মথুরানাথ বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আদর্শ শিক্ষকসুলভ একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সর্বপরি সুউচ্চ এক ছাত্রদরদী মন ছিল। প্রদীপনারায়ন ঘোষ বন্দনা দে সম্পাদিত ‘আমার শিক্ষক’ প্রবন্ধ গ্রন্থে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছেন, -

“খুব ছোটখাটো চেহারার ধূতি পাঞ্জাবি পরা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ মানুষটির মুখে এবং চোখে সর্বদাই হাসির ছাপ ছিল। কিন্তু প্রয়োজনে রাগতেও জানতেন। আমাদের ছাপা বুকলিস্টে তাঁর নামের পাশে ছাপা হতো বি. এস সি (ডিস্টিশন)। শুনেছি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন। সে যুগে স্কুলে শিক্ষকের

খুবই অভাব ছিল। তাই অঙ্ক বা বিজ্ঞানের সমস্ত ক্লাস প্রায় বরেন বাবুকেই নিতে হত। খুবই রসিক মানুষ ছিলেন। ক্লাসে পড়বার সময়ও তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত। ... বরেন বাবু আমাদের অংক আর ভূগোল পড়াতেন। খুব বেড়াতে ভালবাসতেন। তাই ভূগোল ছিল ওর প্রিয় বিষয়। ... সেযুগে শিক্ষকদের বহু বিষয়ে একসঙ্গে পড়ানোর অভুত ক্ষমতা ছিল। তার মধ্যে ছিল একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং ছাত্রদের মন।”^{১৬}

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরে শিক্ষকতার পাশাপাশি পুনরায় নিজ সাহিত্যিক প্রতিভাকে উন্মুক্ত করলেন। সুন্দরবনের অভিজ্ঞতাকে ঘিরে ১৯৫৮ সালে একটি গল্প লিখে ফেললেন। সেই বিখ্যাত গল্পটির নাম ‘বজরা’। এই গল্পটি লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম গল্প। গল্পটি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। লেখক দেশ পত্রিকায় লিখেছেন, -

“আমার প্রথম গল্প বজরা। এ গল্পে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নন্দলাল ব্যানার্জি ছিলেন অন্যতম চরিত্র। গল্পে তাঁর নামটা পালটে করেছিলাম আনন্দ চাটুজ্যে, আর যে বজরায় দিনের পর দিন সুন্দরবনের নদীপথে ওর সঙ্গে আমি ঘুরে বেরিয়েছি সেই বজরাকে একটা প্রতীক হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলাম।”^{১৭}

বজরা গল্পটির মূল বিষয়, পঞ্চাশ বছর আগে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের হর্তা-কর্তা সব বাবুরা বাইজিদের জলসা বসাতেন তাঁদের প্রিয় বজরার অন্তরমহলে। মদের নেশায় চুর হয়ে বাইজি নিয়ে ফুর্তি করতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। আবার প্রয়োজন মতো সেই বজরায় বসেই রাজ্যশাসন করতেন। পঞ্চাশ বছর পরেও, দেশ-কাল-পরিস্থিতি এবং মানুষগুলি পাল্টে গেলেও দেখা যাচ্ছে বজরার ভূমিকাটা বিন্দু মাত্র পাল্টায়নি। এখন বজরায় বাইজির জলসা বসে না বটে কিন্তু এখনও একজন বাবা কার্যসিদ্ধির জন্যে তাঁর নিজের মেয়ের আঁচলে মদের বোতল গুজে পাঠান বজরার বাবুদের উদ্দেশ্যে। এখনো বন-জঙ্গল এর ফাঁক-ফোকর দিয়ে অশিক্ষিত চাষাভুষা মানুষগুলোর সন্ধিগ্ন-সতর্ক দৃষ্টি অব্যর্থ নিশানায় অটুট থাকে।

লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আজ অর্ধশতাব্দী পরেও সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনের শুধুমাত্র রকমই পাল্টেছে, রীতি কিছুই পাল্টায়নি। গল্পটি তৎকালীন সাহিত্যিক মহলে ভীষণ সারা জাগিয়ে ছিল। এই গল্পটির হাত ধরেই লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এর অভিষেক হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আসরে।

লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘বনবিবির উপাখ্যান’। এই উপন্যাসটিরও ভিত্তিপ্ৰস্তরও নির্মিত হয়েছিল এই সুন্দরবন এর পটভূমিতেই। অধ্যাপক অভ্রায় এর ভাষায়, -

“বরেনের উপন্যাস বেশিরভাগ সুন্দরবনের মানুষ নিয়েই। এই পরিবেশেই যেন তাঁর নিজস্ব জগৎ। যশোহর খুলনার ইতিহাস তাঁর পড়া ছিল মন দিয়ে। জানা ছিল হোসেন মিঞার ময়না দ্বীপের কাহিনীও। পড়েছিলেন, ‘সুন্দরবনের আর্জান সর্দার’। তারপর ছিল, নিজের টানা চার বছর সুন্দরবনবাসের অভিজ্ঞতা। এর ভিত্তিতেই বরেন চেয়েছিলেন, সুন্দরবনের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচনা করতে। তারই প্রথম প্রয়াস তাঁর বনবিবির উপাখ্যান (১৯৭৮)।”^{১৮}

‘বনবিবির উপাখ্যান’ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবনকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। উপন্যাসটির মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে শুভঙ্কর ঘোষ এর কলমে, -

“বন কেটে বসত করা, চারদিকে অনন্ত জলরাশির মাঝখানে আবাদের মানুষের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সংস্কার, শ্রেণীসম্পর্ক, ধর্ম, চিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বরেনের ‘বনবিবির উপাখ্যান’।”^{১৯}

ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবনসম্পৃক্ত অরণ্যদেবী হলেন বনবিবি। অরণ্য নির্ভর যাদের জীবন-জীবিকা তথা মাঝি-মল্লা, জেলে, মউলে, বাউলে, প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষরাই এই বনবিবির মূল সেবক। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী সম্প্রদায় নির্বিশেষে অরণ্যদেবী হলেন এই বনবিবি আরণ্যদেবী এই বনবিবি সম্পর্কে ড. সুভাষ মিত্রের অভিমত, -

“হিন্দু বা বাঙালি মাতৃ-ভাবময় বনবিবি ‘বনবিবি মা’, ‘বনদুর্গা’, ‘বনচণ্ডী’, ‘বনযষ্ঠী’, ‘বিশালাক্ষী’ ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছেন। অরণ্যদেবী অরণ্যের রক্ষাকর্ত্রী-মুসলিম যুগে বনবিবি হয়েছেন।”^{২০}

এই অরণ্যদেবী মুসলমান সমাজে প্রথম পূজিতা হলেও পরবর্তীকালে হিন্দু প্রভাবিত দেবী রূপেও অধিষ্ঠিত হন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষই ভক্তির আতিশয্যে মাতৃসমা কুলবধূকে দেবীপদে উন্নীত করেছেন। আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত ‘জহুরানামা’য় এই বনবিবি ‘বোনবিবি’ নামে উল্লিখিত হয়েছে।

‘বনবিবির উপাখ্যান’ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে অরণ্য-মাতা তথা বনমাতা ‘বনবিবি’র বন্দনা দিয়ে -

‘বনের মধ্যে বন বিবির কত রে ভাই খেলা।

চতুর্দিকে গাঙের পানি, মধ্যে গোলের মেলা’।

উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে সুন্দরবনের বুড়ো নদী বাসুকির একটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে। এই বুড়ো বাসুকি নদীর পাহারায় গড়ে ওঠা দ্বীপের একটি লাট, যার নাম চৌধুরীদের লাট। কলকাতার এই চৌধুরীদের লাট প্রায় পঁচিশ হাজার একর জমি নিয়ে গঠিত। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে জলরাশি বেষ্টিত এই লাট চৌধুরীদের আবাদ নামে পরিচিত। সুন্দরবন অঞ্চলের বুড়ো বাসুকি বেষ্টিত এই দ্বীপ গুলি সম্পর্কে লেখক বলেন গঙ্গোপাধ্যায় এর ভাষায় উদ্ভাসিত হয়েছে সৌন্দর্যভাবনা, -

“দ্বীপগুলি যেন শ্রীচরণের ঘুড়ুর, আর নদীগুলো সেই ঘুড়ুর বাঁধার সুতো। একটু নড়ে উঠলেই বুঝবুঝ বুঝবুঝ। সুতোয় সুতোয় জট পাকিয়ে যাওয়ার মতো নদীতে নদীতে জট। যেন গোলকধাঁধা। কোথায় শুরু আর কোথায় তার শেষ কে জানে! ... ধানভাঙ্গা সিঁড়ির দেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার। আর পুবেই যাও কি পশ্চিমেই যাও, ছোট ছোট দ্বীপ; কোনটা আগুরের মতো গোল, কোনটা সিমের মতো বাঁকা, আবার কোনটা গোলও নয়, বাঁকাও নয়। কাকড়ার মতো চারপাশে দাড়া ছড়ানো। এমন ধারা আরো কত। ছোট, বড়, হাজার হাজার, অসংখ্য। সত্যি সত্যি বুঝবুঝ করে শব্দ হয় দ্বীপগুলির মধ্যে।”^{২১}

‘বনবিবির উপাখ্যান’ উপন্যাসের কাহিনী সূত্রপাত আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে। লেখক কাহিনীর প্রথমেই সাল এবং মাস উল্লেখ করেছেন, বাংলা তেরশ বাইশ, কার্তিক মাস, শুক্লপক্ষ। উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে চৌধুরীদের আবাদ, এই আবাদ গড়ে ওঠার পেছনে মূল কারিগর ছিলেন চৌধুরী পরিবারের ছোট কর্তা, তিনি চেয়েছিলেন এই বাদার আবাদে জনপদ বসুক, হাট-বাজার হোক, বুড়ো বাসুকীর ওপর দিয়ে হাজার হাজার নৌকা চলবে, ব্যাপারী আসবে, স্কুলবাড়ি তৈরি হবে, তৈরি হবে পাঠশালা-মন্ডব আর সবার উপরে এর নাম হবে চৌধুরীদের আবাদ, গড়ে তোলার এই স্বপ্ন এবং সংগ্রামের কাহিনী রয়েছে সমস্ত উপন্যাস জুড়ে। চৌধুরীদের প্রাক্তন নায়েবমশায়ের পুত্র দয়াল ঘোষ বাদায় আবাদ করার দায়িত্ব নেন, দয়াল ঘোষের নেতৃত্বে চল্লিশ জন কাঠুরে, সাঁওতাল নিয়ে গড়ে ওঠে এই আবাদ। সাথে সুন্দরবনের পাকা অভিজ্ঞ লোক রজনী এবং বাঘের মুখ থেকে বেঁচে আসা ঈশান, মকবুল এর মত সাঁওতাল ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ। সমস্ত উপন্যাস জুড়ে রয়েছে কঠিন সংগ্রাম, পদে পদে মৃত্যু ভয়, সর্বোপরি সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষগুলির বিশ্বাস ও সংস্কার।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত সব উপন্যাস ‘সন্ন্যাসী বাওয়ালি’, ‘নদীর সঙ্গে দেখা’ ‘বাগদা’ এবং শোনা যায় ‘কাকচরিত্র’ নামে আরও একটি উপন্যাস সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের পটভূমিতে তিনি লিখেছিলেন কিন্তু উপন্যাসটি আজ দুপ্তাপ্য। বলাবাহুল্য এই ‘কাকচরিত্র’ উপন্যাসটি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম উপন্যাস এবং সুন্দরবনের পটভূমিকায় লেখা প্রথম উপন্যাস। যা তৎকালীন ‘কথামালা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবন কেন্দ্রিক রচনাগুলিতে রয়েছে জল, জঙ্গল এবং জলকর জীবনের প্রাধান্য। বনবিবি, মাকাল ঠাকুর প্রভৃতি লোকদেবতার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা, প্রকৃতির সঙ্গে জীবিকার লড়াই। মিথ-রিয়ালিজম সর্বোপরি লোকবিশ্বাস ও বাস্তবতার মিশ্রণ তাঁর এই রচনাগুলিকে অনবদ্য করে তুলেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, -

“মনোজ বসুর টোপোগ্রাফিকে নতুন করে ব্যবহার করেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।”^{২২}

কলকাতার ‘কফিহাউস’ তখন তরুণ সাহিত্যিকদের ‘মক্কাগৃহ’। কফি হাউসের এই তরুণ সাহিত্যিকরাই তখন তৎকালীন সাহিত্যের মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠাকর্তা, কে সাহিত্যিক আর কে সাহিত্যিক নন, কি সাহিত্য আর কোনটি সাহিত্য নয় তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব এই কফি হাউসের তরুণ যুবকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এমন সময় লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও কফিহাউসের আড্ডায় যাতায়াত শুরু করেছেন, ক্রমে তরুণ সাহিত্য শিল্পীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠতে শুরু করেছে, তাঁর, -

“ ‘পরিচয়ের’ সঙ্গে তখন জড়িত দেবেশ, দীপেন, কিছু অংশে মতিও। দেবেশ সামান্য কয়েকটা গল্প লিখেই সারা ফেলে দিয়েছে, মতিও। এর আগেই গল্প লিখিয়ে হিসেবে সন্দীপন বেশ পরিচিত কলম। কলম থামিয়ে নতুনভাবে লেখার কথা ভাবছে। দেশ পত্রিকায় সত্যি সত্যি তখন নতুন নতুন লেখকের আবির্ভাব। সোমনাথ, যশোদাজীবন, রতন, আরো অনেকে। ... আমরা কেমন করে যেন এক গুচ্ছের নতুন লেখক জড় হয়ে গিয়েছিলাম। সবারই এককথা, নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন ভাবে লিখতে হবে। যেমন করে আগেকার লিখিয়েরা লিখে গেছেন ঠিক তেমনটি নয়, নতুন কিছু। লেখার বিষয় থেকে শুরু করে রীতি প্রকৃতি সব কিছুই পালটে ফেলার যেন প্রয়োজন এসে গেছে।”^{২৩}

সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যধারার মূল ভিত্তিপ্রস্তর সুন্দরবন হলেও সমকালীন সময়ভিঘাতে তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে একের পর এক নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক বিভিন্ন আখ্যান। এই ধারার গল্প উপন্যাসগুলি মূলত বক্তব্য প্রধান তথা আইডিয়া প্রধান। আইডিয়া প্রধান কাহিনী সম্পর্কে লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত, -

“আমার অধিকাংশ গল্পই বক্তব্যপ্রধান। বিশেষ কোন আইডিয়া বা বক্তব্যকেই মুখ্য চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাবার দিকে প্রবণতা আমার বেশি। বক্তব্যই মুখ্যত আমার নায়ক। ফলে তথাকথিত যেসব চরিত্র দ্বারা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সেইসব চরিত্রের প্রতি আলাদা কোন অনুকম্পা আমার নেই। এবং ছোটগল্পে তার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত বলেই আমার মনে হয়।”^{২৪}

এই বক্তব্য বা আইডিয়াকে চরিত্র করে অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, ‘কালবেলা’, ‘সহবাস’, ‘তোপ’, ‘দধীচীর হাড়’, প্রভৃতি গল্পগুলি তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

‘কালবেলা’ গল্পটিতে দেখা যায় একজন লোক একজোড়া হাঁস, একটা কুকুর ও একটা মেয়ে মানুষ পুষত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই লোকটাকে পুষত অনেকেই। লোকটার অসংখ্য প্রভু ছিল। তাদের মধ্যে তাঁর মনিব তো ছিলই, আরও ছিল তাঁর সংস্কার, তাঁর বিবেকবুদ্ধি, তাঁর বিবেচনা, তাঁর বন্ধুবান্ধব, এমনকি যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে লোকটি বাস করত সেই প্রকৃতিও তাকে পুষত। মূলত এই প্রতীকী গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে, মানুষ কোনও দিন মুক্ত নয়। দাসত্ব করার জন্যই জন্ম হয়েছে মানুষের। সমস্ত মানুষের সমস্ত বোধগুলি সারাক্ষণ তার পরিমণ্ডলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের কাছে এর চেয়ে বেদনার কথা আর কি থাকতে পারে। মানুষ সৃষ্টির চরম দুঃখজনক পরিণতি। স্বাধীন মুক্ত মানুষের কল্পনা যারা করেন তারা সত্যকে গোপন করেন।

মানুষ যে স্বাধীন নয়, মুক্ত নয়, এই আইডিয়া প্রতীকী রূপ লাভ করেছে ‘তোপ’ গল্পটিতে। পুরনো একটা তোপকে ঘিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা মেলার বিবরণ তোপ গল্প। মেলা যখন শুরু হয় তখন দেখা যায় তোপের হিমশীতল খোলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষ আবার মেলা যখন শেষ হয় দেখা যায় ক্লান্ত, শান্ত সেই মানুষগুলিই বিন্দু বিন্দু আকার ধারণ করে খোলার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে।

মানুষ বাঁচতে চায়, বেঁচে থাকাটাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু বাঁচতে হলে মানুষকে পরাস্ত হতেই হবে। মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে যে মানুষ সে মানুষ পর্যদস্ত। সেই আপাত বিজয়ী মানুষটার ভেতরে তাকালে দেখা যাবে সে মানুষ ক্ষতবিক্ষত। ছলে-বলে-কৌশলে মানুষকে জয় করেও সে মানুষের সংগ্রাম শেষ হয় না। তারই অলক্ষ্যে সমান্তরাল ভাবে যে জগত তৈরি হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, একটা সময় সেই জগতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাকে। ঠিক তখনই ঈশ্বর কিংবা নিয়তি কোন কিছুকেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না তাঁর। এমনকি স্বীকারোক্তি দিয়েও তাঁর নিস্তার পাবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না তখন। অহরহ তাকে জড়িয়ে পড়তে হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখকসত্তার আর একটি বড় দিক আমরা দেখি ডিটেকটিভ তথা গোয়েন্দা কাহিনিমূলক আখ্যান রচনায়। তিনি একাধিক গোয়েন্দা কাহিনি তথা আখ্যান নির্মাণ করেছেন, ‘ইয়েতি রহস্য’, ‘হিমশীতল’, ‘সাহেবকুঠি’, উল্লেখের দাবী রাখে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘হিমশীতল’ ডিটেকটিভ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন সুবোধ দাশগুপ্ত। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেন প্রফুল্ল রায় মহাশয়কে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞাপনটি এইরকম, মৃত্যুর পর দেহটিকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাই। নাম ঠিকানা হীন এই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। উপন্যাসের পটভূমি কলকাতার পার্ক সার্কাস থেকে শুরু করে ভারত ব্রহ্মদেশ সীমান্তের কাছাকাছি একটি পার্বত্য অঞ্চল নীলঝোঁরার নীল টেম্পল এর রহস্যময় দুর্গর মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসে আমরা দেখি বিজ্ঞাপন দাত্রী সুভদ্রা দেবী রাজ বংশের পুত্রবধূ। ভগ্নপ্রায় সুবিপুল রাজ অটালিকার তিনি একমাত্র রক্ষাকত্রী। দুই মেয়ে বাইরে থাকে। রাজ্যপাট বহুকাল আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে শুধু রয়ে গেছে রাজরানী সুলভ আত্ম সম্মান। আর সে আত্মসম্মান রক্ষার্থেই সুভদ্রা দেবী তার স্বামীর কাছে গিয়ে মৃত্যুর পর তার কাছে যেতে চান। তার এই অদ্ভুত বাসনাকে বাস্তব করার অভিপ্রায়েই প্রাইভেট ডিটেকটিভ অরুণ ও তার বন্ধু ব্রতীশ এর নীল টেম্পল যাত্রা এবং সেই ভগ্নপ্রায় দুর্গ এবং রাজাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনার কাহিনি এই উপন্যাস। রহস্য রোমাঞ্চ উৎকর্ষের পাশাপাশি লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ডিটেকটিভ অরুণের বাড়ির বৃদ্ধ কাজের লোক রঘু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে হাস্যরস ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে তা অনেকটা ড্রামাটিক রিলিফ এর কাজ করেছে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমরা জানতে পারি লেখকের ছিল ভ্রমণ পিপাসু মন। বিশেষ করে ‘হিমালয়’র প্রতি লেখকের ছিল আশ্চর্য এক দুর্বলতা। এই হিমালয় ভ্রমণেরই একটি চিত্রাকর্ষক কাহিনী লেখক আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন ‘ইয়েতি রহস্য’ আখ্যানটিতে। ‘টিকলিগড়ের হত্যা রহস্য’ রহস্য রোমাঞ্চ পূর্ণ উপন্যাস ধারায় আর একটি নবতর সংযোজন। টিকলিগড় নামটিও চমকপ্রদ উপন্যাসটিতে রহস্য ঘন ঘনীভূত হয়েছে টিকলি গড়ের রাজবাড়ীর গৃহকত্রী শ্রীমতি ললিতা রায় দেবীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। টিকলি গড়ের রাজবাড়ীর গৃহকত্রী শ্রীমতি ললিতা রায়, পৈত্রিক সূত্রে তিনি বিশাল সম্পত্তির মালিক। পিতা পুরন্দর বাবু ছিলেন ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিরাট অভ্র ব্যবসায়ী। ললিতার বয়স যখন ছয় তখন ললিতা মাতৃহারা হন। তাই পুরন্দরবাবু ললিতাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখেন। জামাই অপরেরকে ব্যবসাপত্র বুঝিয়ে দেন এবং ট্রেন দুর্ঘটনায় পুরন্দর বাবু মারা যান। এদিকে দীর্ঘ দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে ললিতা ও অপরিসের কোন সন্তান হয়নি। তারা একটি অনাথ আশ্রম খোলার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই আশ্রমটিই ঘটনাচক্রে কীভাবে ললিতাদেবীর খুন তথা মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে সেই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এর ‘সাহেব কুঠি’ উপন্যাসটি রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার-অলৌকিকতা সর্বোপরি বাস্তবতার সংমিশ্রণে এক অনবদ্য রচনা। উপন্যাসের পটভূমিকায় রয়েছে সুন্দরবনের নিকটবর্তী কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে সুন্দরবনের নিকটবর্তী একটি জেলেদের গ্রাম। সাত দিনের ছুটি নিয়ে জেলেদের এই গ্রামে ঘুরতে এসেছে সৌরেন ও কেয়া। সৌরেনের ঠাকুরদার কেনা এই দুর্গে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী নিয়েই উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি গবেষণা অভিশব্দভঁটির চতুর্থ অধ্যায়ে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নগরজীবনকেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস ‘কলকাতা কলকাতা’। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। তবে ১৯৭২ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘দি গ্রেট ক্যালকাটা সার্কাস’ নামে। কলকাতা মহানগরী যেন মস্ত বড় একটি সার্কাস, -

“জাল জুয়াচুরি মিথ্যেকথা
এই তিন নিয়ে কলকাতা”

উপন্যাসের শুরুতেই কলকাতা নিয়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের এই দুই ছত্র ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন কলকাতা তথা ষাট-সত্তর দশকের শহরাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা, বিপর্যয়, বিশ্বাসহীনতা, ছিন্নমূল, ঘুণধরা, আদর্শবর্জিত, অবক্ষয়িত কলকাতার নগ্ন রূপ। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোপাল মধ্যবিত্ত পরিবারের এক বাঙালি সন্তান। সে বিচিত্র ভঙ্গি করে স্ট্যাচুর

মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। নেতাজির মতো এক হাত সামনের দিকে তুলে রেখেছে, অন্য হাতটি সি আর দাসের মতো বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখেছে। এবং একটা পা গাঙ্গীর মতো করে সামনের দিকে কিছুটা বাড়িয়ে রেখেছে। তাঁর বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গোপাল মধ্যবিত্ত এক বাঙালি পরিবারের সন্তান। বঙ্গভঙ্গের পর পাকিস্তান ছেড়ে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার জন্যই তাঁর কলকাতা আগমন। সে লক আউট কারখানার ছাঁটা হওয়া এক অসহায় কর্মী। গোপাল চরিত্রটি সমকালীন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে একটি বিশেষ অবক্ষয়িত যুগের নিম্নবিত্ত জীবন সংগ্রামী মানুষদের প্রতিনিধি করেছে। লেখকের এই ‘গোপাল’ চরিত্রটি নিয়ে দেবেশ রায় লিখেছিলেন ‘কলকাতা ও গোপাল’, আবার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ‘তোমার উদ্দেশ্যে’ নামক গল্পে লেখেন ‘গোপাল আর নাই’। এই সবই লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দি থ্রেট ক্যালকাটা সার্কাস’ যার পরিবর্তিত নাম ‘কলকাতা কলকাতা’ উপন্যাসের গোপাল চরিত্রটির জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করছে। কলকাতা নগরীর সুদীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় লেখক উপলব্ধি করেছেন এক চরমসত্য। সত্যতা ও আদর্শ আজ শুধুমাত্র পুঁথিবদ্ধ নীতিকথা মাত্র, নাগরিক মানষিকতার অধঃপতন ধরা রয়েছে উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে, -

“আদর্শকো মারো গোলি। বুদ্ধুরাই আদর্শ নিয়ে ঘষাঘষি করে। অনেক কিছু তো দেখলাম বাবা। সব মাইরি ভো-ভো। সবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কেরিয়ার। আদর্শ নিয়ে যারা কথা বলে তারা সব ফোর-টোয়েন্টি।”^{২৫}

নগরজীবন কেন্দ্রিক আরও একটি শক্তিশালী আখ্যান ‘সনাক্তকরণ’ গল্পটি। সন্তোষ কুমার ঘোষ এই গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন। গল্পটির বিষয়বস্তু এইরকম, কলকাতার রাস্তায় একটি বাচ্চা ছেলে গাড়ি চাপা পড়েছে। এই ঘটনা জনবহুল কলকাতার নিত্যনৈমিত্তিক একটি সাধারণ ঘটনা। মুখে একটা মুখোশ পরে বাচ্চাটি রাস্তায় খেলছিল, ঠিক তখনই আচমকা একটা গাড়ি এসে বাচ্চাটিকে পিষে দিয়ে ছুটে পালায়। তখন গল্পের কাহিনীধারায় আগমন ঘটে গল্পের প্রধান চরিত্র গল্প কথকের। ঘটনাটি দেখেই তাঁর বুকের মধ্যে ডিপ ডিপ করতে থাকে, মনে পড়ে তাঁর ছেলে খোকনের কথা। খোকোনও এমনি করেই মুখোশ পরে খেলে। তাঁর মনে হয় খোকনেরও যদি এমন হয় কখনো, আর সে ভাবতে পারেনা। টেঁচিয়ে ওঠে সে। ট্যাক্সি- ট্যাক্সি- বলে চিৎকার শুরু করে দেয় উদভ্রান্তের মতো এবং একটা ট্যাক্সিতে করে বাচ্চাটিকে প্রায় বুক তুলে নিয়ে হাসপাতালে ছোটে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে যখন লোকটি বাইরে বেরিয়ে আসে হঠাৎ তাঁর মাথা যেন বিগড়ে যায়, সে ভাবে ছেলেটা যদি আর না বাঁচে! তাহলে? ছেলেটির বাড়ির লোকেরা কিছুই জানবে না? মর্গেই পড়ে থাকবে শেষ শরীরটা? কেউ খোঁজ পাবে না ছেলেটার? ভাবতে ভাবতেই সে যেন মর্গের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, -

“মর্গ। চওড়া টেবিলের ওপর শোয়ানো চাদর-ঢাকা দেহগুলি। কাটা-ছেড়া অংশগুলি সেলাই করে জুড়ে রাখা।

হ্যালো, ও মশাই, শুনছেন? ছেলেটাকে তো খুব হাসপাতালে দিয়ে এলেন। এখন নিয়ে আসবে কে? অথবা বললেই হয়, আমরা সৎকার করি। মর্গে আর কতক্ষণ ফেলে রাখা যায়!

ও, তাই বুঝি! ওর বুঝি কাউকেই পাওয়া যায় নি। চলুন তাহলে। আমি কালো রংয়ের আঁশটে গন্ধওয়ালা পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। যেন বহুকালের এই স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা ঘরে হিপোপটেমাছের মুখোশ-পরা ছেলেটা একমাত্র আমার জন্যই অপেক্ষা করছে।

রক্ষীকে শুধালাম, কোথায়? কোন টেবিলে?

দেখে নিন, তিন-চারটে আছে ওই বয়সের। কোনটা আপনার, দেখে নিন। ... আমি টেবিলে হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম। মুখের কাপড় সরিয়ে সরিয়ে দুটো একটা মুখ চিনবার চেষ্টা করলাম। কোথায় হে, সেই মুখোশ-পরা মুখটাকে কোথায় রেখেছ?

লোকটা হাসলো। এটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা?

বললাম, না। ও যে নির্মল চোখ! মুখোশ কোথায়? মুখোশ পরিয়ে দাও, তবে যদি চিনতে পারি।”^{২৬}

বাংলা গল্পে মুখোশপরা মানুষের কথা বরেন গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে নিয়ে এলেন, এর আগে কোন সাহিত্যিকের কলমে এভাবে উন্মোচিত হয়নি।

দুর্ভিক্ষপীড়িত নগরাঞ্চলে মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আরেকটি অন্যতম আখ্যান ‘অন্নসত্র’ গল্পটি। গল্পটির নামকরণ করেছিলেন গীতিকার শচীন ভট্টাচার্য। কিশোর বয়সে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা সেই বিখ্যাত ছবি ‘আমার মা’, এরই ছায়াপাত ঘটেছে এই গল্পটিতে। গল্পের প্রধান চরিত্র উমা। হাড় বের করা, রোগা লিকলিকে শরীর। কোলে বছর চারেকের জিরজিরে একটি বাচ্চা। স্বামী চুরির দায়ে জেল খাটছে। ঘরে বুড়ো শ্বশুর হাপটানের রোগী। কারো পেটেই ভাত নেই। লতাপাতা, গেড়ি-গুগলি সেদ্ধ খেয়ে তিনজনের কোনমতে দিন চলে যায়। এমন সময় উমা খবর পায় হরিপুরের রেললাইনের ধারে চালের লরি উল্টে পড়ে তিনটি লোক চাপা পড়েছে। চারদিকে শুধু বস্তা বস্তা চাল ছরানো। কাতারে কাতারে মানুষ ছুটছে সেই দৃশ্য দেখতে উমাও খবরটা শুনেই বাচ্চাটিকে পাঁচকোলা করে তুলে দীর্ঘরাস্তা ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে ক্ষতবিক্ষত তিনটি মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে কিন্তু সেদিকে তাঁর কোন দ্রষ্টব্য নেই। তাঁর নজরে পড়ে, সামনেই জল কাদার মধ্যে পড়ে থাকা চালের বস্তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটিকে মাটিতে রেখে পাগলের মত বস্তাটাকে খামচে, খুবলে, নখ দিয়ে ফুটো করে প্রাণপণে শাড়ির আঁচলে চাল ভরতে শুরু করে এবং এক কোচর চাল নিয়ে বাচ্চাটিকে এক হাতে তুলেই বাড়ির পথে ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। রাত্রিতে অনেকদিন পরে তারা তৃপ্তি করে ভাত খায়। বুড়ো শ্বশুরটি চেটেপুটে থালা শেষ করে বউকে বলে, -

“একটা কথা শুধোব বউ!

উমার মুঠো-ভর্তি হাত মুখের কাছে এসে পলকের জন্য থেমে গেল, কি?

চালে-টালে রক্ত লেগে ছিল না তো বউ? ভালো করে দেখে নিয়েছো তো?

উমা ভাতের গরাস মুখে পুরল, লাগুক না, কি এসে যায়! হুগুয় দু’বার একবার ও’রম যেন লরি উল্টায় ভগমান।

বুড়ো আর একটোক জল খেল, তিন তিনটে লোক সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে, খেয়াল আছে?

উমা মুখ ভর্তি ভাত নিয়েই জবাব দিল, আর দু’দুটো লোক যে পেটপুরে ভাত খেতে পেল, সেটা!”^{২৭}

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সচ্ছন্দ বিচরণ ছিল মাটিঘেঁষা মানুষগুলির জীবন-যাপনের সরলতম রূপ বর্ণনায়। সুন্দরবনের পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ ভালো ভালো সব লেখা। নগরজীবন কেন্দ্রিক কাহিনী রচনায় কখনোই পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি লেখক তবে শহর কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলীর মানুষদের নিয়েও বেশ কিছু স্মরণীয় গল্প উপন্যাস তিনি আধুনিক পাঠককে উপহার দিয়ে গেছেন। ১৯৫৮ সালে লেখক সুন্দরবনের শিক্ষকতার চাকরি রেখে যখন কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে থাকার বন্দোবস্ত করলেন, সেই সময়পর্বে একদিকে লেখকের কলমে যেমন উঠে আসছে সুন্দরবন, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল, জলকর, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন আখ্যান তেমনই পাশাপাশি কলকাতার দীর্ঘদিন বাস করার ফলে তৎকালীন ভগ্নপ্রায়, ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক জীবন তথা কলকাতার সমাজচিত্র বাঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাহিনী ধারায়। এই সময়কালে লেখক নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক বেশকিছু আখ্যান রচনা করেছেন, ‘নিশীথফেরি’, ‘ঘাতক’, ‘অসতি’, ‘ফাঁদ’, ‘দলবদল’ প্রভৃতি উপন্যাস, ‘জব চার্নকের কলকাতা’, ‘সনাক্তকরণ’, ‘অন্নসত্র’ প্রভৃতি গল্প উল্লেখের দাবী রাখে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি গবেষণা অভিশন্দর্ভটির তৃতীয় অধ্যায়ে।

কলকাতার ঘেরাটোপে থেকে জীবনযাপন করলেও লেখক বারংবার অনুভব করেছেন সুন্দরবনের সাথে তাঁর আত্মার যোগ। লেখক সুন্দরবনের মানুষ, তথা সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবন সংগ্রামের সাথে একাত্ম হয়েছেন বারংবার, -

“আমার কাহিনীর জন্য তখন যেসব চরিত্র এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারপাশে তারা অধিকাংশ এসেছে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল থেকে।”^{২৮}

সুন্দরবনের পটভূমিতে তিনি যখন আখ্যান রচনা করছেন তাঁর কলম বাধাহীনভাবে তার অভিযুক্ত নির্ণয়ে সক্ষম, প্রস্তুতি হয়ে উঠেছিল কিন্তু নগরজীবন কেন্দ্রিক কাহিনীগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে লেখকের তীব্র ক্ষোভ, কটাক্ষ এবং বঞ্চনার গুঞ্জন। হৃদয়ের আবেগ এখানে বাক্যাহত। নাগরিক জীবন সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে পীড়িত করত বারংবার, -

“স্বস্তির বিষয় কলকাতায় বাস করেও নগর জীবন তেমন করে আমাকে স্পর্শ করেনি কখনো। কলকাতার মানুষগুলোর আলাদা কোন ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র আমার চোখে ধরা পড়ে না। বাইরের চাকচিক্য কিংবা চোখ ধাঁধানো জৌলুস আছে কলকাতায়, কিন্তু ভেতরে তাকালে সেই একই পরাজয়মন্যতা।”^{২৯}

লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাগরিক জীবন-অভিজ্ঞতার এই বিশেষ দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের নগরজীবন কেন্দ্রিক রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে। কলকাতায় দীর্ঘকাল বাস করেও নাগরিক জীবনের সাথে কোনদিনই লেখকের আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নগরের মানুষগুলি যেন মুখোশের আড়ালে অভিনয় করা এক একজন বহুরূপী।

তবে সুন্দরবন ছাড়াও লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভালোলাগার-ভালোবাসার আরও একটি জায়গা ছিল। সেটি হলো তুষারস্বর্গ ‘হিমালয়’। প্রতিবছরই লেখক হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গে ভ্রমণে বেরোতেন এবং তাঁর সেই ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর ভ্রমণসাহিত্য সম্ভারে। লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুস্থানীয় সাহিত্যিক অধ্যাপক অত্র রায় লেখকের ভ্রমণ পিপাসু ছন্নছাড়া মনটি তাঁর লেখনীতে অমর করে রেখেছেন, -

“লেখকের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ! সেবারে আমাদের গন্তব্য ছিল হিমালয়ের ‘মিলাম’। এশিয়ার বৃহত্তম হিমবাহ মিলাম। গৌরীগঙ্গার পবিত্র উৎসভূমি। একদিকে যার ঝকঝকে শুভ্র ত্রিশূলি পাহাড়। আর অন্যদিকে চিরতুষারাবৃত নন্দাদেবীর দিগন্তজোড়া বিস্তার! চোখ ফেরে না যেন দেখে। লোকবিশ্বাস, কোজাগরি পূর্ণিমার রাত্রে এখানে নাকি দেবী স্বয়ং এসে দর্শন দেন কখনও কখনও। একবার সেদিকে তাকিয়ে থাকলে কথাটা যেন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয়। খুবই দুর্গম ছিল আমাদের সেই পার্বত্য অভিযান, আকাশবাণী কলকাতা থেকে তখন খবর প্রচারিত হয়েছিল আমাদের মিলাম অভিযানের সাফল্যের কথা জানিয়ে। প্রতিটি অভিযাত্রীর নাম উল্লেখ করে। ... ফিরে এসেই বরেন লিখেছিলেন - তুষার স্বর্গ মিলাম। এমনি করেই বেরিয়ে এসেছিল তাঁর পিন্ডার হিমালয়ে, বহুপতির দেশে ইত্যাদি ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনাগুলি।”^{৩০}

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রমণ সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দুই ছিল হিমালয়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো হিমালয়কে ভালবাসতেন লেখক। হিমালয়ের প্রতি এই অত্যধিক টানই পরবর্তীকালে লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে একের পর এক সাহিত্য, যা পরবর্তীকালে ভ্রমণসাহিত্য পদবাচ্য হয়েছে। লেখকের ভ্রমণ সাহিত্যের ভান্ডারে রয়েছে ‘পায়ে পায়ে হিমালয়’, ‘পা বাড়ালেই হিমালয়’, ‘তুষার স্বর্গ মিলাম’, ‘পিণ্ডার হিমালয়’, ‘বহুপতির দেশ’। হিমালয়ের নিসর্গ বর্ণনার পাশাপাশি হিমালয়ের মানুষজন, তাদের আচার-আচরণ, সংস্কার-রীতি-নীতি, জীবনসংগ্রাম, জীবিকা, ভৌগোলিক তথা ইতিহাস চেনার প্রতি আলোকপাত করেছেন লেখক। তুষারস্বর্গ হিমালয় নতুনভাবে ধরা দিয়েছে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে। এক নতুন আঙ্গিকে হিমালয়কে পাঠককুলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেখক। সুন্দরকে দেখার মত যথেষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টি তাঁর ছিল। তবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ভাষা ব্যবহারের সারল্য ও স্বচ্ছতা। সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন এর ভাষায়, -

“বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নরম নিরীহ ধরনের মানুষ। বেশ অন্যজাতের লেখক। এমন সব বিষয় নিয়ে গল্প লেখেন অবাক লাগে। ভাষা বেশ স্বচ্ছ।”^{৩১}

স্বেচ্ছা-নির্বাসনপ্রাপ্ত, নিভৃতচারী এই লেখক কোনদিনই সাহিত্যজগতে হটসেলার হবার বাসনা পোষণ করেননি, কোন সম্পাদক বা প্রকাশকের তুরূপের তাসও তিনি ছিলেন না, -

“এক প্রকাশক আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কি লেখেন মশাই? মেয়েছেলে নিয়ে কচলাতে পারেন না? লিখুন না একটা রগরগে লেখা আপনারও হোক আমারও হোক দু পয়সা।”^{৩২}

কিন্তু এই সাহিত্যচর্চা সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কখনই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ছিল হিসেবে বিবেচিত হয়নি। তাই সেদিন সেই প্রকাশকের নিবেদন তিনি অবলীলায় অগ্রাহ্য করে স্বতন্ত্র এক আত্মদর্শনের নিরিখে নিজ সাহিত্য সাধনাকে সুউচ্চ আদর্শে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে সাহিত্যচর্চা ছিল এক সারস্বত সাধনা।

সমকাল এই গুণী লেখকের মর্যাদা দিতে পারেনি। কিন্তু আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ও সাহিত্য সাধকেরা যখন বাংলা সাহিত্যের শিকড় সন্ধানে উন্মুখ, খুব সঙ্গত কারণেই সাহিত্যের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া এই সব কলম অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে, যাদের লেখনীতে ধরা রয়েছে বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধমান অতীত।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৪
২. তদেব, পৃ. ১১৮
৩. মিত্র, অমর, 'গুণী লেখক ছিলেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়', শিল্প ও সাহিত্য (ওয়েব ম্যাগাজিন) গল্প পড়ার গল্প, সাক্ষাৎকার : ২৯ অক্টোবর ২০১৭, <https://www.ntvbd.com>
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৭
৫. তদেব, পৃ. ১১৮
৬. তদেব, পৃ. ১১৮
৭. রায়, অভ্র, 'বরেন গঙ্গোপাধ্যায়', আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, চতুর্দশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, মে ২০০২, পৃ. ১৮৯
৮. 'বর্গী এলো দেশে' ছড়ার বই এর ভূমিকা অংশ।
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৮
১০. তদেব, পৃ. ১১৮
১১. তদেব, পৃ. ১১৮
১২. তদেব, পৃ. ১১৮
১৩. মন্ডল, ড. দেবজ্যোতি, 'সুন্দরবন ও কথাসাহিত্য', সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ১৪ এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১২৭
১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০
১৫. তদেব, পৃ. ১২৩
১৬. দে, বন্দনা, সম্পাদিত : 'আমার শিক্ষক', 'আমার শিক্ষক সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়', প্রদীপনারায়ণ ঘোষ, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৪৩
১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন: 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০
১৮. রায়, অভ্র, 'বরেন গঙ্গোপাধ্যায়', আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, চতুর্দশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, মে ২০০২, পৃ. ১৯৬
১৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত), 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার', 'বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : বহুমাত্রিক জীবনের ক্ষেত্রসন্ধানী কথাকার' : শুভঙ্কর ঘোষ, প্রজ্ঞা বিকাশ, পৃ. ১৬
২০. মিস্ত্রি, ডঃ সুভাষ, সুন্দরবনের লৌকিক দেবী বনবিবি : একটি পর্যালোচনা' নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র, পঞ্চম সংখ্যা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১

২১. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'বনবিবির উপাখ্যান', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪, পৃ. ৩
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২১, মাঘ ১৪২৭, পৃ. ৩৪৫
২৩. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২২
২৪. তদেব, পৃ. ১২৩
২৫. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'কলকাতা কলকাতা', অনন্য প্রকাশন, জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ২২
২৬. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, গল্প সমগ্র, করুণা প্রকাশনী, আগষ্ট ২০১২, পৃ. ১২৩
২৭. তদেব, পৃ. ১৯৪
২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২২
২৯. তদেব, পৃ. ১২৪
৩০. রায়, অভ্র, 'বরেন গঙ্গোপাধ্যায়', আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, চতুর্দশ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, মে ২০০২, পৃ. ১৯৯
৩১. হক মিলন, ইমদাদুল, 'বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প' বাংলাদেশ প্রতিদিন (ওয়েব ম্যাগাজিন), পিছনে ফেলে আসি, সাক্ষাৎকার, ১০ মে ২০১৯, শুক্রবার, <https://www.bd-pratidin.com>
৩২. গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন, 'আমার দেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৪